বিভূতিভূষণ আসলে কী

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ১৯৪১ সনের বর্ষাকালে। ক্লাস ফোরে পড়ি। জ্বরে ভুগতাম। সবে সেদিন জ্বর ছেড়ে গেছে। অনেকদিন পরে ভাত খাব বলে বারান্দায় বসে আছি। কিন্তু মা বড়ো দ্বিধায়। কারণ, জ্বর রেমিশনের পরেই অমাবস্যা পড়েছে। ভাত খেয়ে শেষে ভাতের রসে ফের না জ্বর আসে।

এমন সময় দু-নম্বর এক্সারসাইজ বুক সাইজের বাঁধানো একখানি বই হাতে পড়ল, খুলে দেখি *অপরাজিত*। সেই আমার বিভূতিভূষণের সঙ্গে পরিচয়। পড়ছি আর মনে হচ্ছে অন্য একজন মানুষের জীবনের ভিতরে ঢুকে পড়েছি। অনেক সময় এমন হয়না যে — কোনো বাড়ির অন্দর খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে হঠাৎ দেখি বাড়ির কর্তা মন দিয়ে বসে জুতোয় কালি করছেন আর গিন্নি হাঁড়ি উপুড় করে ভাতের ফ্যান গালতে গালতে কর্তাকে কী যেন বলে যাচ্ছেন। এই সময় এগোনো যায় না। অন্যের জীবনের রহস্য চুম্বকের টানে টেনে রাখে।

বিভূতিভূষণ যতবারই পড়েছি ততবারই আমার একথা মনে হয়েছে। একবারও মনে হয়নি এ হল গিয়ে লেখা — এ হল গিয়ে উপন্যাস। সবটাই যেন জীবন।

পথের পাঁচালী-র আগে *অপরাজিত* পড়েছিলাম। তার আগে আমার পড়াশুনোর ইতিহাস অনেকটা এরকম *ঠাকুরমার ঝুলি, হোঁদোলকুত্‌কুত্, ঝিলে জঙ্গলে, কালো ভ্রমর* ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপরাজিত পড়ছি আর চোখ জলে ভরে গিয়ে কালো কালো হরফগুলি মুছে যাচ্ছে। অপু কলকাতায় চলে যাবে বলে ট্রেন ধরতে বেরিয়েছে — ট্রেন না পেয়ে ফিরে এসে দেখে মা সর্বজয়া গায়ে জ্বর নিয়ে কাঁথা কাপড় কাচতে পুকুরের ঘাটলায় বসেছেন। তার গায়ে এসে পড়েছে বিকেলের পড়ন্ত রোদ। দু-ধারে বাঁশঝাড়। মা বলে ডাকতেই সর্বজয়া ঘুরে পুকুরের উঁচু পাড়ে তাকালেন। এই জায়গায় এসে চোখের জল ধরে রাখা যায় না।

বড়ো হয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছি বাংলা কোনো উপন্যাসের কোনো বাঙালি নব যুবক চাকরি খুঁজছে কি না। *অপরাজিত*-তে প্রথম দেখলাম যুবক অপু ঘুরতে ঘুরতে শেষে শিশি ধোয়ার কাজ পেল।

লেখাটি পড়বার সময় লক্ষ করেছি কোথাও বলা নেই এ জীবন অনিত্য। আশ্চর্যের কথা *অপরাজিত*-এর চরিত্রগুলি অনেক ঘোরাঘুরি করেছে কিন্তু সব ঘোরাঘুরি মিথ্যে হয়ে গেছে এই না বলা অথচ ফুটে ওঠা এক ব্যাপক অনিত্যবোধে।

অপরাজিত উপন্যাস কেমন একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু আমার বিস্ময় ও আচ্ছন্ন দশা না বলে আমি পারছি না। যে বাড়িতে অপু সস্ত্রীক ভাড়া থাকত সে বাড়ির বাড়িউলি যখন বলেন দমদমার গুলির কারখানা — তখন এই দমদমা উচ্চারণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আসঙ্গ আমার মনে ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিপত্নীক অপু একদিন নিশুতি রাতে ভাড়া নেওয়া ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে ঘোড়ার পাশে পাশে হেঁটে চলেছিল। পাশেই গভীর রাতের জ্যোৎস্নারাত গোয়ালিয়র পাহাড়। এইখানে বিভূতিভূষণের একটি বর্ণনা আছে আমার সে কথাগুলি মনে নেই কিন্তু সেই কথাগুলির স্বাদ আমি চোখ বুজলেই আস্বাদ করতে পারি।

গল্প-উপন্যাসে অনেকরকম অবস্থার বিবরণ থাকে কিন্তু জ্ঞাতি সম্পর্কের ভাই কলকাতায় এসে যখন হতদরিদ্র কোনো মানুষকে অবস্থাপন্ন ভেবে প্রতিহিংসা বশে খরচ করিয়ে দেবার চেষ্টা করে তখন কী হয়? এরকম একটি অবস্থার বিবরণ *অনুবর্তন* উপন্যাসে আছে। সে যে কী ভয়াবহ বিবরণ তা না পড়লে বোঝা যাবে না। যদু মাস্টার অত্যন্ত দরিদ্র স্কুল শিক্ষক। গ্রাম থেকে তার জ্ঞাতিভাই অবনী এসে উঠেছে তারই বাড়িতে। সে মনে করে যদু মাস্টার অতি বড়োলোক। যদু মাস্টার যতই তাকে ঘাড় থেকে নামাবার চেষ্টা করে অবনী ততই গেড়ে বসে। এই বিবরণ আর এই অবস্থা বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও আমি পড়িনি। ঠিক এভাবেই বলতে পারি *ইছামতী* উপন্যাসে গয়া মেম আর প্রসন্ন আমিনের সম্পর্ক। তেমনই বলতে পারি *দৃষ্টিপ্রদীপ* উপন্যাসে পাগল বাবাকে লোকালয় থেকে তাড়িয়ে দেবার সময় তার ছোটো ছেলের মনের অবস্থা। যেমন কিনা বলতে পারি দুর্গার মৃত্যুর বহুকাল পরে অপু যখন তার দিদির লুকিয়ে রাখা পুরোনো ভাঙা চুড়ি কুলুঙ্গিতে খুঁজে পায়।

কোনো গল্পে অন্তে চমক কিংবা মাঝখানে নাটক আর উপন্যাসে বিশাল সব ঘটনার ঘনঘটা তিনি কখনোই ঘটাননি। তাঁর লক্ষ ছিল মানব সম্পর্কের তীব্র ঘনিষ্ঠতম জায়গায় পৌঁছোনো। সেই মানব সম্পর্ককে তিনি সর্বদাই বিশাল ও বহুতা নিসর্গের পটভূমিতে আঁকতে চেয়েছেন। আর বারবার তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন এই প্রকৃতির ভেতর কোথায় লুকিয়ে আছে তার স্রষ্টা। তিনি যেভাবে এই স্রষ্টাকে মানুষের ভেতর, নদীর ভেতর, পাহাড়ের ভেতর খুঁজে বেড়িয়েছেন তা শুধু লেখকের অনুসন্ধান নয় — যেন বা কোনো সাধক উপাসক আর্তি নিয়ে খুঁজছেন জগৎ ও জীবনের রহস্য।

কোনো এক সময় আসতে পারে যখন মানুষ মনে করতে পারে রবীন্দ্রনাথ একজন বীর, নজরুল একজন সাধক, বিভূতিভূষণ একজন সাঁই।

একথা বলছি এজন্যে, লেখাই বিভূতিভূষণের প্রধান লক্ষ ছিল না। প্রধান লক্ষ ছিল জীবন রহস্য সন্ধান। সেই সন্ধানের পথে লেখাগুলি হয়ে গেছে।

যে কোনো শিল্পই তার সময়ের যৌগিক কারণ। যেমন কিনা হাইড্রোজেন অক্সিজেন ছিল বলে জল হয়েছিল। বিভূতিভূষণও তাঁর নিজের সময়ের একটি যৌগিক কারণ। কিন্তু শুধু যৌগিক কারণ হলেই সবকিছু জলের মতো কালোত্তীর্ণ হয় না। বিভূতিভূষণ জলের মতোই কালজয়ী হয়ে উঠেছেন। এই জয় কতটা স্থায়ী হবে আজই বলা যায় না কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর চুয়াল্লিশটি বছর কেটে গেছে। তবু তার লেখা জীর্ণ হয়নি। এই লক্ষণটাই বলে কালের মৌলিক কারণ হয়েও তাঁর পরবর্তী সময়কার আধুনিকতা তাঁকে ছুঁয়ে উঠতে পারেনি।

খুব ভালো করে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পড়া না থাকলে *পথের পাঁচালী* আর *আরণ্যক*-এর

ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আবার অন্যদিকে বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি চাকরি নির্ভর হয়ে চাকরির সন্ধানে জেরবার সেই অবস্থা খুঁটিয়ে দেখে অনুভব না করে *অপরাজিত*-এর সূচক অপুকে আঁকা যায় না। লিখে বাঙালি লেখকরা যখন কলকাতার ঘরবাড়ি করতে শুরু করলেন বিভূতিভূষণ তখন কলকাতার মেসে একটি বিছানা রেখে চালকি-বারাকপুরে চলে গেলেন।

তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা আর ইতিহাসের পটভূমিতে সেই চেতনাকে যাচাই করার চেষ্টায় ভীষণ মিল পাই। এই পৃথিবী কী করে গড়ে উঠেছিল তার ভূতাত্ত্বিক রহস্য আর মহাবিশ্বে, মহাকাশে জ্যোতিষ্কের টানাপোড়েন — এসবই জীবনানন্দের মতোই বিভূতিভূষণকে বারবার আলোড়িত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে অনেকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে আমার মনে হয়েছে *ইছামতী* তখন পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। শুরুই হচ্ছে এই বলে — '১২৭০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েচে সবে।'

আবার জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা খালি করে দিয়ে সবাই যে গাঁয়ে ছুটেছিল তার এক নিখুঁত ছবি *অনুবর্তন*-এর বেশকিছু পাতা জুড়ে আছে। এমন তীব্র বিবরণ আর কোথাও পাইনি।

তাঁর লেখক জীবন তুলনায় খুব দীর্ঘ নয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৫০। এই সময়ের ভেতর ১৯২৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান, বিপ্লববাদ, ইংরেজ বিদায় — সবই পড়ে। এর কিছুই তিনি লেখেননি। অথচ আজ তিনিই তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড়ো প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক। তাঁর বিষয় ছিল নিরুপায় মানুষ আর সর্বপ্লাবি প্রকৃতি। তাঁর বিষয় ছিল মৃত্যুবোধ আর ইতিহাসের অমোঘ পদক্ষেপ। এইসব নিয়ে তিনি আধুনিকতাকে মাড়িয়ে সর্বাধুনিক হয়ে উঠতে পেরেছেন।

দিবারাত্রির কাব্য ।। বিভূতিভূষণ সংখ্যা।। দ্বিতীয় বর্ষ, অক্টোবর ১৯৯৪